স্থানীয় সরকারঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও এ সময়ের করণীয়

ড. তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাহি সদস্য, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক কেন্দ্রীয় কমিটি (১২ মে, ২০১০)

স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সরকারঃ দুর্বলতার রেখাচিত্র

স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা নিয়ে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। বেশিরভাগ আলোচনায় একটি বিষয় ঘুরে-ফিরে আসে তা হচ্ছে "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী" করতে হবে। প্রশ্ন জাগে স্থানীয় সরকার কি শক্তিহীন? যদি শক্তিহীনই হয় তাহলে শক্তির যোগান কীভাবে দেয়া যাবে? বহু বছর ধরে এ লক্ষ্যে প্রকল্প রচনায় কোনো বিরাম নেই। বহু প্রকল্প এখনও মাঠে আছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে না। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব, স্থানীয় সরকার একটি ব্যবস্থা, পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দ ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে মোটেও দুর্বল বা শক্তিহীন নয়। 'শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পগুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যই দুর্বলতার কথা বেশি করে বলা হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তির সত্যিকারের ক্ষেত্রগুলোকে আড়াল করে আমরা তার দুর্বলতার স্থানগুলোকে বেশি করে তুলে ধরে থাকি। তাতে করে তাদের শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ আরও বেশি বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের শক্তির একটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

সারাদেশে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে সব মিলিয়ে প্রায় ৫,৩০০ প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ৬৪ হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি বা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। এ সকল নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী নির্দেশিত কার্যক্রমের বাইরেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঐতিহ্যগতভাবে করে আসছেন, যার কোনোরকম জাতীয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান নেই বা নেই কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। সেটি হচ্ছে 'ঐতিহ্যগত সালিশী ব্যবস্থা'। এ ব্যবস্থার অধীনে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তি হয়। প্রতি নির্বাচিত ব্যক্তির নেতৃত্ব গড়ে সারা বছর ৫টি করে বিরোধ মীমাংসায় অবদান রাখলেও ৬৪ হাজার স্থানীয় নেতা বছরে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। আমাদের পুরো বিচার ব্যবস্থা গড়ে বছরে ১ লাখ মামলাও নিস্পত্তি করতে পারে না। অপরদিকে সারা দেশে পুলিশী মামলা যত হয় তার বহুগুণ বেশি অপরাধের ঘটনা স্থানীয়ভাবে নিস্পত্তি হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় নেতৃত্বে ব্যক্তিগতভাবে এক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তার কোনো মূল্যায়ন কোথাও হয় নি। সত্যিকারের মূল্যায়ন হলে বোঝা যেত বিরোধ নিস্পত্তি, অপরাধ দমন, অপরাধ প্রতিরোধ, সামাজিক সংহতি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে অর্ধ লক্ষাধিক নেতৃবৃন্দ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

এক্ষেত্রে তারা সবসময় পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার করেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ থানা পুলিশ এবং আনুষ্ঠানিক আদালতের চেয়ে তাদেরকেই 'মন্দের ভালো' হিসেবে ধরে নিচ্ছেন। এটি কি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় নেতৃত্বের একটি শক্তির ক্ষেত্র নয়? কোনোরকম পুলিশী ও আইনি সহায়তা ছাড়া কোন শক্তি বলে তারা এ অসাধ্য সাধন করেছেন? এরকম স্থানীয় সরকারের শক্তিমত্তার আরও বহুক্ষেত্র রয়েছে। আমাদের এ সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র, এলিট শ্রেণী ও ক্ষমতাবানদের দুর্বলতা হচ্ছে তারা সে শক্তির ক্ষেত্রগুলোকে বুঝে ব্যবহার করতে পারছে না। স্থানীয় সরকারের শক্তির বিচরণের স্বাভাবিক ক্ষেত্রসমূহ বিকাশে সহায়তার পরিবর্তে পদে পদে বাঁধার সম্মুখিন করা হচ্ছে। জাতীয় সরকার জাতীয় ক্রিয়াকাণ্ড ভুলে ক্রমশ স্থানীয় সরকারের অধিক্ষেত্রের মধ্যে আগ্রাসন চালাচ্ছে। 'জাতীয় সরকার' বেশি মাত্রায় ও পরিমাণে 'স্থানীয়'তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তাতে বাড়ছে দ্বন্দ্ব, বাড়ছে সংঘাত। দু'পক্ষেরই তাতে শক্তিক্ষয় হচ্ছে। দু'পক্ষই প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছে। জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার উভয়ই এভাবে রক্তশূন্য ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

তাই যারা আমরা স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করছি, তাদের একুট ভাবতে বলব 'দুর্বলতা রোগ' স্থানীয় সরকারের নয়, এটি জাতীয় সরকারেরই রোগ; স্থানীয় পর্যায়ে তার বিস্তার ঘটেছে মাত্র। তাই জাতীয় সরকারের রোগ আগে সারিয়ে তুলুন। স্থানীয় সরকারের রোগ স্বাভাবিক নিয়মেই সেরে যাবে।

জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্ষমতা, কার্য এবং অর্থ সম্পদের বিভাজন একটি দ্রুপদি রাজনৈতিক বিতর্কের অংশ। এক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতায়ন বটিকার মাধ্যমে (প্রকল্প কার্যক্রমের) এ সমস্যার নিরসন সম্ভব নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে আসল জায়গায় ঔষধ প্রয়োগ না করায় এ রোগের বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছে। রোগটি মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির। তাই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির ভিতরে এ জটিল ব্যাধির যে আবাস সে দুর্গে আঘাত করতে হবে। সেখানে কোনোরকম নিরাময় পদ্ধতির সূচনা না হলে এ ব্যাধি অব্যাহত গতিতে বাড়তে থাকবে।

সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা এবং তার একটি অনুকরণ-অনুসরণযোগ্য পথ রচনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ৬৪ হাজার নেতৃত্বকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন আজ অনেক অনেক বেশি জরুরি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অনেকরকম পন্থা নিয়ে আজকাল কথা হচ্ছে। তারমধ্যে অন্যতম সূত্রগুলো হচ্ছে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের অধিক কর্তৃত্ব প্রদান, অধিক অর্থ, জনবল ইত্যাদি। এগুলো জরুরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ততোধিক জরুরি হচ্ছে অসুস্থ, অশিষ্ট, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্গত উপব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠা স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং মৃত্তিকা লগ্নতার দৃঢ় একটি ভিত্তি সৃষ্টি। দুর্নীতি ও নীতি-নৈতিকতাহীনতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের জন্য তাদের প্রস্তুত করা।

স্থানীয় সরকার, স্থানীয় পর্যায়ের জাতীয় নেতা এবং তাদের কর্মীবাহিনী সবাই একটি বিশেষ মন্ত্রণালয়ের চাল-গমের পিছনে যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং সকল স্থানীয় নেতৃত্ব পর্যুদস্থ।

আজকাল স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দ, জাতীয় নেতৃত্ব এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে জিআর, টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ১০০ দিনের কর্মসৃজন, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড এসব নিয়ে যেরকম আগ্রহ ও বিবাদ বিসম্বাদে জড়িত হয়ে পড়ছেন, তাতে স্থানীয় সরকার ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার

সাথে যুক্ত সবারই কিছুটা শংকিত হবার কারণ আছে। প্রতিজন নেতা-নেত্রী যেভাবে ঐ একটি বিষয়ের সাথে নিজেদের সকল কামনা-বাসনাকে একাকার করে দেখছেন তা ভবিষ্যতে সৎ, সুষ্ঠু, সুস্থ ও গণমুখি নেতৃত্ব বিকাশে মোটেও সহায়ক হবে না। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের চরিত্র বদল না করে শুধু আইন পরিবর্তন করে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে না।

তাই স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার আন্দোলনের সাথে জড়িত সবাইকে স্থানীয় সরকারের মূলশক্তি কেন্দ্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তারপর আন্দোলন সংগ্রামের নীতি-কৌশল ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আন্দোলনকারী নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা ও স্থানীয় নেতৃত্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই এ মুহূর্তে স্থানীয় সরকার কেন এবং জাতি কীভাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশমান ভূমিকাকে দেখতে চায় সে সম্পর্কে একটি ঐকমত্য দরকার।

সংবিধানসম্মত স্থানীয় শাসন কাঠামো হিসাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করতে হলে স্থানীয় নেতৃত্বকে তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের খোলস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে জনস্বার্থ, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রতিনিয়ত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এখানে স্থানীয় সরকারের ভিতরের ও বাইরের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সবারই এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ অবস্থান গ্রহণ আবশ্যক। যে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশের জন্য নাগরিক সমাজ আন্দোলন করবে সে নেতৃত্ব যদি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী আচরণ করে, কিংবা চাল-গম, দুম্বার গোস্ত, রিলিফের টিনের চোরাবালিতে বার বার হারিয়ে যেতে থাকে তাহলে সে আন্দোলনের ভবিষ্যত কী?

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যত বেশি সৎ, নিষ্ঠাবান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের বিকাশ হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হবে তত শক্তিশালী। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সুবিধাবাদী, ফায়দাবাদী, মেরুদণ্ডহীন ও নতজানু নেতৃত্বের একটি ধারা বর্তমান রয়েছে। এ অচলায়তন থেকে নেতৃত্বকে বের করে এনে তাদের যত বেশি করে মেরুদণ্ড সোজা করে শক্ত দু'পায়ের ওপর দাঁড় করানো যাবে স্থানীয় সরকারের শক্তির বিকাশ হবে তত দ্রুত। জাতীয়ভাবে নীতিভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, নৈতিকতার মানদণ্ডহীন নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যদি এ নেতৃত্বের জন্ম ও বিকাশ ঘটতে থাকে তাহলে এখানেও বেশিদূর যাওয়ার অবকাশ কম। আইন-কানুন পরিবর্তনের আন্দোলনের সাথে নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি জনমুখি ধারায় বিকাশের নীতি ও কৌশলও তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় সরকার নেতৃত্ব তৈরির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জাতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও বিকাশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। জীবনে প্রথমবার কেউ যখন কোনো স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তখন তিনি তার বুকে অনেক সুন্দর স্বপ্নকে ধারণ করে থাকেন। চোখে-মুখে দেশপ্রেমের ছবি এবং মনে ধারণ করে জনসেবার অদম্য আগ্রহ। শুরুতে মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না এমন লোক প্রকৃত অর্থেই বিরল। কিন্তু কালক্রমে আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির "দশচক্রে ভগবান ভূত" হয়ে পড়ে। এক সময় কয়েক টন গম বা চালের মধ্যে সকল সততা, নিষ্ঠা, নীতি-নৈতিকতার সমাধি হয়। অনেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলেও হয় চরমভাবে পরাজিত।

এ দুর্নীতি, অনিয়ম ও আত্মসাতের দুষ্টচক্র থেকে নতুন নেতৃত্বকে কীভাবে রক্ষা করে তাদের মধ্যে মাথা উঁচু করে সত্য-ন্যায়-নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার শক্তি সাহস যোগানো যায় তার উপায় খুঁজতে হবে।

আমাদের দেশের সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ইতিহাসই শুধু নয়, গত ৫০ বছরের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতিকে বহু বিখ্যাত রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব উপহার দিয়েছে। আমাদের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের একটি উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। এ মুহূর্তে জাতিকে গভীরভাবে ভাবতে হবে ভবিষ্যতে বর্তমানকার "ধামা, কুড়াল ও কিরিচবাদী" ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতি কি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেতে পারবে? তাহলে দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা কীভাবে রক্ষিত হবে। নেতৃত্বের অনুশীলন, পরিশীলন, চর্চা ও পরিচর্যা কোথায় কীভাবে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সনাতনী ভূমিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পালন করবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার একটি প্রশিক্ষণাগার হিসাবে আর্বিভূত হতে পারে। অতীতেও আমাদের অনেক বরেণ্য জাতীয় নেতা স্থানীয় সরকারে তাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। নেতাজী সুভাষ বসু, শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক, এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পৌরসভার দায়িত্ব পালন করেছেন। এটিই নেতৃত্ব সৃষ্টি, লালন ও পরিপক্কতার অন্যতম সরল ও স্বীকৃত পথ।

আমাদের সামনে সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজন সঠিক উপলব্ধি ও নেতৃত্বের সঠিক পরিচর্যা। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য পথ ও পন্থায় দেশে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছে। সে নির্বাচনে ৪৮১টি উপজেলা পরিষদে ১,৪৪৩ জন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ঐ বিশেষ পর্যায়ে দীর্ঘ ১৯ বছর একটি বৈধ ও আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের শূন্যতা ছিল। এ নির্বাচন সে শূন্যতা পূরণ করেছে। এই ১,৪৪৩ জন নেতা ও নেত্রীর মধ্যে অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। আইনগত ভিত্তি, প্রশাসনিক আয়োজন ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার সবই বিদ্যমান। যদি এ ১,৪৪৩ জন নেতা-নেত্রী আগামী ৪/৫টা বছর পরিষদে বসে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ লাভ করে, তাহলে দেশের সার্বিক নেতৃত্ব কাঠামো, নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হবে।

আমরা যতদূর এই নতুন নেতৃত্বকে বুঝার চেষ্টা করেছি তাতে মনে হয়েছে এখনও এদের বেশিরভাগই সততা অনুসারী ও সততার অনুশীলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখনও আপোষকামিতা, ফায়দাবাদীতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের বেড়াজাল এদের যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করেনি। এদের সঠিকভাবে বিকাশের সুযোগ দিলে জাতি ভবিষ্যতে হাতে-কলমে কাজ করে ঋদ্ধ একটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরম্পরা সৃষ্টি করতে পারবে।

উপজেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন মাপের নেতা বা নেতৃত্ব রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা-নেত্রী হিসাবে এই ১,৪৪৩ জন বের হয়ে এসেছেন। এ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলে আগামীতে তাদের মধ্যে কেউ থাকবেন, কেউ হয়ত থাকবেন না। পরিষদে না থাকলেও ঐ এলাকায় অভিজ্ঞ বিরোধী হিসাবে একটি অবস্থান গ্রহণ করবেন। আবার কেউ কেউ আরও অধিকতর বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে জেলা ও

জাতীয় সংসদে যেতে পারেন। তাই যে কোনো মূল্যে এ নেতৃত্বকে হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। বরঞ্চ স্থানীয় পর্যায় তথা তৃণমূল থেকে ধাপে ধাপে নেতৃত্বকে উচ্চতর পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন: বর্তমান সময়ে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে এদের মধ্য থেকে অনেকে জেলা পরিষদে যাবেন। জেলা পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদে যাবেন। অনেকে আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হবেন। বর্তমান চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ ও মহিলা)দের মধ্যে রাজনৈতিক দলের অনেক জেলা, উপজেলা এমনকি জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের নেতা-নেত্রী রয়েছেন। তাছাড়া পেশাজীবী যথা আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তো আছেনই।

রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে তারা এক ধরনের কাজ-কর্ম করেন। কিন্তু চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাহি ভূমিকায় সম্পৃক্ত হবার যে সুযোগ তা এই একগুচ্ছ নেতৃত্বকে মেধা, মনন ও নেতৃত্বের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দেবে। তাই এ নেতৃত্বকে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসাবে বিকাশের সকল সুযোগ দিতে হবে এবং এ কাজে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।

অনিশ্চিত স্থানীয় নির্বাচন ও নিরুদ্বেগ নাগরিক সমাজ

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এদেশে ৩০০ সদস্যের একটি জাতীয় সংসদ থাকলেই চলবে। এককেন্দ্রিক এ রাষ্ট্রে একটি সংসদ, একজন প্রধানমন্ত্রী ও একটি মন্ত্রী সভা থাকলেই যথেষ্ট। অন্য কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচনী রোডম্যাপে ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ছিল। চারটি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী) ও ৯টি পৌরসভা নিবাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে দাবি ছিল জাতীয় নির্বাচন আগে হোক তারপর স্থানীয় নির্বাচন করা যাবে। জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেলো। নির্বাচিত সংসদ ও সরকার স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে রহস্যজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ। দুই বছরের বেশি সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ৪,৫০০ ইউনিয়ন পরিষদ ও ৩০০ পৌরসভা আধা কার্যকর। তারা এখন কাজ করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে তাই অচলাবস্থা চলছে। সরকার, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নিজস্ব সমিতিসমূহ এবং নাগরিক সমাজ সর্বত্র একটা নির্বিকার অবস্থা।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের প্রধান বিরোধী দলসহ সবাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকল। নাগরিক সমাজ থেকেও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কেও একই অবস্থা। কিন্তু পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে নানারকম প্রকল্প রচনা ও সম্পদ প্রবাহ সমানে চলছে।

এরকম একটি অর্ন্তবর্তী সময়ে নির্বাচনকে অনিশ্চিত রেখে অর্থ সম্পদ বরাদ্দ করলে সেখানে সে অর্থ সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় না এবং সত্যিকার অর্থে হচ্ছেও না। তাই এ সময়ের অপচয় অনিয়মের দায়ভার কে গ্রহণ করবে।

উপজেলা পরিষদে কি বরফ গলা শুরু হয়েছে?

উপজেলা পরিষদ ১৪/১৫ মাস ধরে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চেয়ারম্যানদের ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ আইনে যতটুকু সুযোগ রয়েছে ততটুকু সুযোগ গ্রহণ করেও পরিষদ কাজ করতে পারেনি। যেমন: পরিষদের নিয়মিত সভাসমূহ সঠিক পদ্ধতিতে হয়নি, একটি অর্থবছর (২০০৯-২০১০) শেষ হতে চললেও ঐ বছর উপজেলা পরিষদের কোনো বাজেট হয়নি, হয়নি পরিষদের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, গত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেয়া হলেও উপজেলা পরিষদ সে অর্থ নিজেরা ব্যবহার করতে পারেনি। ঐ অর্থ পূর্ব নিয়মে ইউনিয়ন পরিষদে বণ্টন হয়ে গেছে। পরিষদে ন্যস্ত সংস্থাপনসহ ১০টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা দেড় বছর পূর্বে উপজেলা পরিষদ গঠনের পূর্বে যেভাবে কাজ করতেন সে একই নিয়মে এখনও কাজ করছেন। এখানে ক্ষমতা হারাবার ভয় ও শঙ্কা ভীষণ একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। উপজেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা এই তিনটি প্রধান ক্ষমতাকেন্দ্রে দারুণ উদ্বেগ। কে কখন কোন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হারিয়ে বসেন।

সাম্প্রতিককালে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের দু'টি দলে প্রায় ১৮৫ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ঐসব প্রশিক্ষণে মন্ত্রী পরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি চেয়ারম্যানদের অপ্রাপ্তি, হতাশা ও প্রত্যাশার কথা শুনেছেন। বিশেষত মন্ত্রী পরিষদ সচিব এ প্রশিক্ষণের পরপরই পরিষদে সরকারি কমকর্তাদের ন্যাস্তকরণ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু কথা বলেছেন এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে নুতন করে আদেশও দিয়েছেন। তাছাড়া ১০টি মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নিয়ে উপজেলা বিষয়ে সভাও করেছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ও প্রয়োজনীয় বিধিগুলো চূড়ান্ত করেছে বলে জানা গেছে। তাই আইনে জাতীয় সংসদ সদস্যের উপদেষ্টা ও উপদেষ্টার উপদেশ-পরামর্শ বহির্ভুত অন্যান্য হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও পরিষদ অন্তত কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান সময়টি উপজেলা পরিষদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত অর্থ বছরে পরিষদের কোনো বাজেট হয়নি। কেন হয়নি সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নেয়া উচিৎ। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা এই তিন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া উচিৎ। আবার আগামী অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কে এখনও কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। তা যদি না হয় তাহলে আরো একটি বছর অপচয়ের হিসাবে যুক্ত হবে।

তিন খুঁটির ঘর, আল্লাহর দিকে পড়

উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এ তিনজনই শুধুমাত্র পরিষদের নিজের লোক। এই তিনটি নড়বড়ে খুঁটির ওপর উপজেলা পরিষদ নির্ভরশীল। কিন্তু এ পরিষদেও আরও তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ রয়েছে। কর্মকর্তাগণ এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ। ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রগণ মনে মনে উপজেলাকে আপদ মনে করছেন। তার ওপর রয়েছে বেশিরভাগ এমপি'র বিরোধিতা। এ তিন শরীকের বিরোধ এড়িয়ে এটিকে টিকানোর উপায় কি?

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন এ তিন স্তরে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। ভারসাম্যপূর্ণভাবে এ তিন স্তরে স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থা কার্যকরের কোনো বিকল্প নেই। এগুলো ভারসাম্যপূর্ণভাবে চালু হলে কেউই ক্ষমতা হারাবে না। এখানে হার-জিতের প্রশ্ন বড় নয়। দেশের নাগরিক হিসাবে এখানে সবার জিত হবে। এখানে সবার জন্য win-win situation তৈরি করা সম্ভব। এখানে এমপি, সরকারি কর্মকর্তা এবং পরিষদ সবারই ক্ষমতা বাড়বে। একজন কর্মকর্তা শুধুমাত্র কর্মকর্তা হিসাবে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেন। জনপ্রতিনিধির সাথে মিলে কাজ করলে তিনি তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারবেন। একজন জনপ্রতিনিধির অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অফুরন্ত কর্মোদ্দ্যম এবং জনসম্পৃক্ততা থাকে। কিন্তু সকল সদিচ্ছাসমূহকে বাস্তব কাজে পরিণত করতে দক্ষ কর্মকর্তার সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ তাকে সহায়তা দিয়ে তার অর্জনকে বহুগুণে বর্ধিত করবে। একজন জাতীয় সংসদ সদস্য যদি নিজে স্থানীয় সরকারবান্ধব হন তাহলে তিনি চারদিকে তার অনেক হাত, পা, চোখ, কান বিস্তৃত করতে পারবেন। স্থানীয় সরকার পাবে তাদের অভিভাবক। এটি সবার জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান সৃষ্টি করতে পারে। উপলব্ধির দৈন্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এখানে একটি সম্ভাবনার স্থানকে অহেতুক কণ্টকাকীর্ণ করেছে। জাতি হিসেবে বিষয়টি আবার আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

উপজেলা পরিষদের জন্য কিছু সুপারিশ

সরকার কি করছেন বা না করছেন সেদিকে অবশ্যই পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকারের বন্ধুগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে, কিন্তু দেশের ৪৮১টি পরিষদকে কার্যকর ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে নির্বাচিত তিনজন নেতা-নেত্রীরও একটি অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র আইন ও সরকারের উপর সকল দোষ চাপিয়ে এ দায় এড়ানো যাবে না। যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে ততটুকু নিয়ে যাত্রা শুরুর কৌশল আবিষ্কার করতে হবে। সে কাজটি করার জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের জন্য কতিপয় পরামর্শ থাকল।

১. যে কোনো অবস্থায় প্রতিটি পরিষদের তিনজন নেতা-নেত্রীর ঐক্যে ফাটল ধরানো যাবে না। তিনজনে মিলে প্রতিটি উপজেলার একটি রূপকল্প নির্মাণ করুন এবং তার ভিত্তিতে উপজেলার জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে ব্যাপক মত বিনিময় শুরু করুন।

২. আগামী অর্থ বছরের বাজেটের খসড়া তৈরিতে নিয়োজিত হউন।

৩. উপজেলা পরিষদের সভায় আপনাদের রূপকল্প ও কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে সিদ্ধান্ত নিন।

৪. আইনে নির্ধারিত ১৪টি স্থায়ী কমিটি করে ফেলুন এবং কমিটিগুলোর সভা শুরু করুন। সে কমিটিসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, সরকারি সেবার নজরদারী এবং নতুন নতুন নাগরিক সম্পৃক্ত কার্যক্রম শুরু করুন।

৫. উপজেলায় ন্যস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে শোভন আচরণ করুন এবং সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। এ সুসম্পর্ক অবৈধ আর্থিক লেনদেন বা অশুভ আঁতাত নয়। শুভ কাজের সূচনার লক্ষ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান।

৬. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সৎ ও দক্ষ করতে হলে জনপ্রতিনিধিকেও সৎ ও দক্ষ হতে হবে। সৎ, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

৭. হাট-বাজার, জলমহল, ফেরীঘাট, ভূমি হস্তান্তরসহ সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতির আঁতাত ভেঙ্গে দিয়ে পরিষদের আয় বাড়াতে হবে।

৮. উপজেলায় দুর্নীতিগ্রস্থ অফিসগুলোর দুর্নীতির কার্যপদ্ধতি চিহ্নিত করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা নির্মুলে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে।

৯. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক, আপত্তিকর ও অপচয়মূলক সম্পদ বরাদ্দের নীতিমালার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এই একটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের সম্পদ বরাদ্দ, ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে দেশের সকল সচেতন নাগরিকদের ভাবতে হবে।

১০. কোনো ব্যক্তি জনপ্রতিনিধির নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সরাসরি ভাগ-বণ্টন করতে পারে না। হয়ে থাকলে তা নিয়ম নয়, গুরুতর অনিয়ম। প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

-